Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর দুটি কবিতা : কবর ও পল্লীজননী

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.2
Pages	14-30
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন ও তাঁর দুটি কবিতা : কবর ও পল্লীজননী

কাজী দীন মুহম্মদ

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে যে আদর্শবাদ বা Idealism-এর অনুশীলনী করে চমৎকৃত করেছেন, সে-গোড়া সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র একটু অতিমাত্রায় বিদ্রোহের সুরেই বাস্তববাদ বা Realism- এর পরশ লাগিয়ে আমাদের উচ্চকিত করে তুললেন। আর রবীন্দ্রনাথ এ আইডিয়ালিজম ও রিয়ালিজমের সমন্বয় সাধন করে দুই অতি-প্রান্তিক ধারার সম্মেলন সাধন করে একমুঠো পথের ধুলো নিয়ে বললেন: সোনা হও। আর অমনি সোনা হয়ে গেল। যে কারণটির জন্য বঙ্কিম হয়ে রইলেন অত্যন্ত দূরের মানুষ, আর শরৎচন্দ্র কাছের হয়েও একেবারে আটপৌরে বলে কেমন যেন 'কাছে থেকে দূর তবু সে মধুর' এমনি আমেজে নিতান্ত পর পর ভাবের নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই আমাদের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এমন অবস্থায় দূরের সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন করে আইডিয়ালের ভাব-প্রবণতার উচ্ছ্বাসের সংগে রিয়েলের সাদামাটা গদ্য জীবনের প্রাণে রোমান্টিসিজমের প্রলেপ দিয়ে অতি-নবায়ন করলেন। ভাবপ্রবণ বাঙালীর আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ রবীন্দ্র-পরিচর্যায় বৃন্দাবনের বিনোদিনী রাধা কম্প্র বক্ষে নম্র নেত্রপাতে, প্রিয় সন্ধ্যা বেলায় যবে তুলসী তলায় আমাদের গৃহাংগনে আধো আলো আধো ছায়াতে রোমান্স সৃষ্টি করে, যাদুকরী মোহে আচ্ছন্ন করে, মুগ্ধ করে। একক সেই রবি-করোজ্জ্বল আকাশের প্রখর রৌদ্রালোকে যখন বাংলা কাব্যের দিক উদ্ভাসিত ঠিক তখনই আকাশের এক কোণে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে গেল, চিলিক মেরে সবার চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে জানান দিয়ে বলে গেল: এই যে, এদিকে আমিও আছি। সব ছেড়ে নিজের দিকে দৃষ্টি কেড়ে নিল সবার। সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলঃ রবি করের উজ্জ্বল তেজ তো নিষ্প্রভ নয়, অথচ এমন আচম্বিত চোখ ঝলসানো যাদুকরী চমকটি কোথেকে কী ভাবে এসে সবাইকে সবার অজান্তে একেবারে স্তম্ভিত হতবাক করে দিল। আমাদের কাব্য-আকাশের এ

চমকটিই নজরুল ইসলাম। নজরুল যে কেবল বিদ্যুৎ ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন, তা–ই নয়। আমাদের নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আর একবার পরীক্ষা করে নেওয়ার সুযোগ দিলেন। নাড়ি টিপে দেখলাম, আমরাও জীবিত। এতদিন ছিলাম কিনা মনেই পড়েনি। নিজেদের সম্বন্ধে ভাবতেই পারিনি। কারণ নিজেদের চেহারা সে সাহিত্যে ছিল প্রায় গরহাযির। এখন নজরুলের আগমনে আবার নতুন করে নিজের সংগে নিজের পরিচয় হলো। আত্মা বিস্মৃত জাতি সম্বিত ফিরে পেলো। আধ–মরাদের কে যেন ঘা মেরে বাঁচালো। দেখা গেল আমারও বলার আছে, আমারও জীবন আছে এবং আমারও কণ্ঠস্বর আছে, আছে সবল মানসোল্লাস, আছে কঠোর ভাষা, দৃঢ় প্রত্যয়। কান্না, সে তো পরাজয়ের। কান্নার ভাষা আমার নয়, আমার ভাষা জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শাবল শক্ত ভাষা।

বাংলা কবিতার এক প্রান্তে মধুসূদনের মহাসমুদ্রের কল্লোল আর একদিকে বিহারীলাল–রবীন্দ্রনাথের তন্ময় ভাবালুতা–Mysticism,

হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু নয়নে
কাহারে ধ্যায়াও। (বিহারীলাল চক্রবর্তী)

–যেন মায়ামৃগ ধরা দেয় আভাসে।

এরই মাঝখানে মন্দ্র গম্ভীরে

বাজিছে দামামা
বাঁধরে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান। (কাজী নজরুল ইসলাম)

এবং মার্চ পাস্ট–

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল্। (কাজী নজরুল ইসলাম)

–আমাদের কেবল ভাবিয়ে তোলে না। এ যেন বলে যায়—শুধু ঘুম-পাড়ানি গান আজি নয়। কেবল জাগলেই চলবে না। যুদ্ধের ডাক এসেছে। ডাক এসেছে জিহাদেরঃ চলো যুদ্ধে যাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি, আত্মাহুতি দেই, আর যে সময় নেই—

ওহে বংগবাসী
মুসলমান রাশি
কেন হে উদাসী
তোমরা এমন? (মোজাম্মেল হক)

সমুদ্রের কল্লোল যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, ভয়ংকরের গভীরতায় শংকিত করে তোলে, মিস্টিসিজ্‌মের তরল আমেজ তেমনি ঝিমিয়ে আনে যেন বহুদিনের যুদ্ধে পরিশ্রান্ত জাতি একটু ঘুমোতে চায়, সে বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত। এ যেন Trozan যুদ্ধের শ্রান্ত সৈনিকদের 'আপিয়াম ইটার'দের Tired eye-lids upon tired eyes- অবশ অলস হয়ে আসে তার প্রতিটি অংগ। তাই এত হৈ চৈ ধূম-ধামের ডামাডোলের মাঝখানে নজরুল এসে বেয়াড়া চীৎকারও করে না, আবার খুব ধীর হয়ে মিহি সুরে 'মমতা মাখানো হৃদয় তোমার, তুমিকি আমার হবে গো', বলে প্রেম ভিখারীর হাতও পাতে না। আমাদের জীবনের কোথায় যেন কী একটা ফাঁক ছিল। কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে গেছে। এ যেন সে কথাটি বলে দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক নতুন স্বাদের সন্ধান দিয়ে গেল। অন্তরের অন্তস্থলে দাগ কেটে গেল। এর একটা দহন আছে, একটা জ্বালা আছে। এ খোঁচা মারে, ঝড় তোলে, উত্তেজিত করে। জীবনের সেই হারানো সুর, সেই পুঁথির জীবনের জংগী পায়তারা 'খেচাখেচি করে মর্দ মারে তলোয়ার' যেন তাদের Pide piper of Hemelin- এর মতো জীবনের সব আকর্ষণ, সব বন্ধন ছিন্ন করে, বের করে নিয়ে যেতে চায়। বলেঃ শির নেহারি আমার নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির। এর মধ্যে আনন্দ আছে, উল্লাস আছে, আছে জীবনের স্পন্দন।

কিন্তু এই তো জীবনের সব নয়। জীবনে Struts and frets আছে,আরো আছে pensive mood। যখন সে বলতে চায়- Life is a tale told by an idiot, আরো বলতে চায়-Our sweetest songs are those that tell of sadest thought। সে জানে জীবনে সংগ্রাম আছে, আছে যুদ্ধ-বীরত্ব, জয়-পরাজয়, জয়ের উল্লাস-উচ্ছ্বাস-পরাজয়ের গ্লানি। সবকিছু মিলিয়ে

যে ক্ষুদ্র জীবন, সে ক্ষুদ্র জীবনের যে ক্ষুদ্রতর অশ্রুবিন্দু তার কি কেউ খোঁজ রাখে? কোন্ অজানা গাঁয়ের বিধবা মাতার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে যে বিলাপ করছে, তাতে তার অন্তরের যে দিকটি তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, তাহলো সে বলতে চাইছে: ওগো পথিক তোমরা দেখে যাও আমার বুক কতখানি খালি হয়ে গেছে। আমার কী ক্ষতিটাই না হয়ে গেছে। আমার কলিজা এফোড় ওফোড় হয়ে গেছে। এ কান্নায় নয়, এ রক্ত ঝরা। শান্ত নিরুদ্বেগ আরাম-প্রিয় বাঙালী জীবনের এ দিকটি:

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনায় ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হযে হইল না শেষ।

– এ চিরন্তন দিকটির কথা আমরা ক্ষণিকের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম। একদিকে হঠাৎ নজরুল যেমন দুরু দুরু বুকে কিন্তু দুঃসাহসের সাথেই আপন বাঁশরী বাজিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন, রবীন্দ্র-মধ্যাহ্ন জ্যোতি ভেদ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলেন, ঠিক তেমনি ভীরু পদক্ষেপে কিন্তু বলিষ্ঠ কণ্ঠে একতারাটি হাতে নিয়ে জসীমউদ্‌দীন আপন মনে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলেন—

কাঁদে এই মাটি, আমি শুধু শুনি মাটিতে এ বুক পাতি,
মাটির বুকের স্পন্দন শুনি, জাগিয়া দীঘল রাতি।
– – –
রাম ধনুরে ধরতে পারি রঙের মায়ায়
ধরব না তা,
বিজলী এনে ভরতে পারি রঙের খাঁচায়
আনব না তা,
আঁকসী দিয়ে পাড়তে পারি চাঁদের চুমো
ছড়ার নূপুর বাজিয়ে তোমায় করতে পারি ঘুমো ঘুমো

পাতাল পুরীর রাজকন্যা সাত মানিকের প্রদীপ জ্বালি
ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমালী স্বপন হাসছে খালি,
এসব কথা ছড়ায় গেঁথে বলতে পারি
বলব না তা,
পাখীর পাখায় লিখন ভরে লিখতে পারি
লিখব না তা,
লিখব আজি তাদের কথা, কথা যারা বলতে পারে,
একশ' হাতে মারছে যাদের সমাজ নীতি হাজার মারে।

২.

জসীমউদ্‌দীনের কবি-মানস ও কাব্য-চেতনার উপলব্ধির এ সমাজ, এ স্বভাব, এ মেজাজটি জানতে হবে। এমনকি আজকের শামসুর রাহমান- আল মাহমুদকে বুঝতেও এটি উপলব্ধি একান্ত প্রয়োজন মনে করি। আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের কাব্য-সাহিত্যের এক একটি ধারায় এক এক দিকপাল নিঃসঙ্গ শেরপার মতোই এভারেস্টে আরোহণ করেছেন-শুধু একা একাকী। সঙ্গ দেওয়ার মতো শক্তি সাহস ও প্রতিভার স্বাচ্ছন্দ্য- একেবারে অনুপস্থিত বললেই চলে।

মধুসূদনের মহাকাব্য গড়ে ওঠে পৌরাণিক মহাকাব্য, বাল্মীকির রামায়ণ আশ্রয় করে। কিন্তু বীজ এ দেশী হলেও এর রস ও সার সঞ্চারে কাজ করেছে বিদেশী হোমার-দান্তে মিল্টন। তবু কবি পর মুখাপেক্ষী নন, অনুকরণানুগ নন; নিজস্ব ভংগিমায়, মৌল চেতনায় তাঁর প্রতিভার সত্যিকার স্বরূপটি তাঁর কাব্যে বিধৃত। তাঁর ভাবে বিভাবিত হয়ে, মুগ্ধ হয়ে, অনুকরণ করতে গিয়ে হেমচন্দ্র-নবীন সেন-কায়কোবাদ ব্যর্থ হয়েছেন। রক্ত ধারায় প্রকৃত বিদ্রোহ- সত্য অনুপস্থিত থাকলে সেখানে বহু-মূল্য বিষয়বস্তুও মার খেতে বাধ্য।

তেমনি নজরুল ইসলাম। তাঁর কাব্যের মূল প্রেরণা পুথি সাহিত্যের ঐতিহ্য সঞ্জাত হলেও তাঁর নিজস্ব অনন্য প্রতিভার অনুকরণ সমসাময়িককালে বা উত্তরকালে সার্থকতায় মন্ডিত হয়নি। গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ শাহাদাত হোসেন, ফররুখ আহমদ প্রকাশ মহিমায় তাঁর চিন্তা-চেতনার কাছাকাছি পৌছুতে পেরেছেন, মনে করি না। তবে সে অনুকরণ সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। তার কারণ, সমসাময়িক স্বাতন্ত্র্যবোধের স্বকীয়তায় প্রত্যেকেই আপন আপন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। গুরুর কাছে পৌছতে হবে

এমনও কোন কথা নেই। পূর্বসূরী যদি উৎসাহিত করে থাকেন, উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে থাকেন, তাহলেই যথেষ্ট। দেখা যায় এঁরা এবং এঁদের আগে পরে অনেকেই নিজস্ব পরিমন্ডলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। তাই বিদ্রোহের সুর স্তিমিত হয়ে এলেও বিদ্রোহী কবির পরেও আমরা 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি'। প্রত্যেকই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হয়ে উজ্জ্বল জ্বল জ্বল করছেন।

আর জসীমউদ্‌দীনও কাব্য–সাধনায় অবতীর্ণ হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম যখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেদীপ্যমান। স্বভাবতঃই তাঁর মধ্যে গীতি–রসাশ্রিত কাব্য সুষমা রোমান্টিকতায় মন্ডিত হয়েছে, দেখলেই আমরা তৃপ্তি লাভ করতাম। কিন্তু তাঁর কাছে আরো একটি অতিরিক্ত প্রাপ্তি আমাদের নতুন স্বাদের সন্ধান দেয়। আমাদের সমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্য ও তার ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি সেটি আত্মস্থ করে নিয়ে অভিনব মোড়কে প্রকাশ করলেন। এবং আমাদের কাছে অভিজ্ঞতার পরিণত পরিপক্ব ফলটি তুলে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ও মরমিয়া গীতি–মূর্ছনা আর নজরুল ইসলামের সমুদ্র গর্জন যেন মহাযাদুকরের যাদু পরশে এক মোহময় জগতের সৃষ্টি করল। মধুসূদন ভাবের অনুগ ভাষা ও আংগিকের সার্থক রূপটি ধরতে পেরেছিলেন, বিদেশী কাব্য–অন্বেষা তাঁকে উপাদান জুগিয়েছে। নজরুল ইসলাম মুসলিম সংস্কৃতি–ঐতিহ্যকে মূলধন করেছেন, তাদের জীবন থেকে রস খুঁজে বের করেছেন এবং আংগিকে অভিনবত্ব আনবার জন্য আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে ছন্দ ও শব্দ–সম্ভার সংগ্রহ করেছেন। এদিক থেকে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের কাব্য–প্রতিভা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। যে নদী মরে গেছে, মজে গেছে, সে শুকনো নদীর খাতেই তিনি নব–প্রবাহের সৃষ্টি করলেন। সে কারণে, তাঁকে নব–ছন্দের বা নব–উৎসের সন্ধানে কারো দরবারে ধর্ণা দিতে হয়নি। তিনি তাঁর উৎসের সন্ধানে পল্লীমুখী হয়েছেন। আমাদের লোকসাহিত্যের পল্লী–গীতিকা শাখায় তার সর–স্বরূপ আবিষ্ট। তিনি মুগ্ধ আবেশে সে সহজ সরল নিরক্ষর কবিদের গাথা পড়ছেন, পালা শুনছেন এবং তা তাঁর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকূল করিল' তাঁর প্রাণ। 'পল্লীর বাগানে যুঁই, কুন্দ, রজনী গন্ধা ও অপরাজিতার অন্ত নাই, পল্লীর বকুল, শিউলী ও অতসীর দান যেরূপ অজস্র, তেমনি শত শত গীতিকা, পালা গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে, বিমোহিত করেছে। বলা চলে, তাঁকে

যাদু করেছে। সরল অনাড়ম্বর স্বভাব-শিল্পীর ন্যায় যেসব পল্লী-কবি, যে সব গ্রাম্য-গায়েন এ সব পালা গান গায়, তাঁরা পল্লীর আনন্দে মশগুল, তারা হাসি কান্নার রোলে পল্লীর আসরকে জমিয়ে তোলেন। তারা জানে যে সে আনন্দ তাদের নিজস্ব, পল্লীর জনসাধারণের অতি আপন। শিক্ষিত সমাজে তাদের কদর নেই। এইখানেই জসীমউদ্‌দীনের বৈশিষ্ট্য। জহুরী জহর চিনে। তিনি বুঝেছিলেন, এই খাঁটি কুসুম, মৌলিক সুরভী। এর মধ্যেই নিহিত পল্লী-প্রাণের সত্যিকার আবেদন। পল্লী কবিরা নিজেদের অজান্তে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথায় মানব জীবনের এমন সার কথা বলেছেন, যা দার্শনিকরাও বুঝাতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেন। তাঁরা স্থানে স্থানে কবিত্বের এমন মর্মস্পর্শী রূপ দেখিয়েছেন, যা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না, কিন্তু জগৎকে মুগ্ধ করবার আমোঘ শক্তি রাখে। এ অমূল্য রস-বস্তুই জসীমউদ্‌দীনের উপজীব্য। আর এ-ই তাঁকে 'পল্লী কবি' আখ্যায় আখ্যায়িত করার অন্যতম কারণ। আর তাঁর এ কাজের সহায়ক হয়েছে দীনেশচন্দ্র সেনের সাহচর্য এবং পল্লী গান ও পালা সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ আর সেখানেই তাঁর প্রতিভা স্ফূরণের ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে।

যখন কবি বলেন,

পীরিতি যতন, পীরিতি রতন, আরো ভালা
পীরিতি গলার হার।
পীরিতি করিয়া যেজন মরে, আরে ভালা
সফল জীবনতার।।

অথবা-

ফুল যদি হই তারে বন্ধু ফুল হইতা তুমি।
মায়ার খোপায় গুইজ্জা রাখতাম বাইড়া বানতাম বেনী।।

কিংবা-

দলিদ্দর অইলাম আমি নছিব বড় বুরা।
আমার পয়সা ঘরে নাইরে পাইলাম মনে পীড়া।।

অথবা-

বগায় যেমন চউখ বুইজ্জা পাগারের ধারে।
এক ঠ্যাংগে খাড়া অইয়া পুডিমাছ ধরে।।

-তখন বুঝতে বাকী থাকে না কবি জসীমউদ্‌দীনের রস গ্রহণের মূল শিকড়টি কোথায়।

৩.

পল্লী–কবি ও পল্লী গায়েনের মুর্শীদা, পালা, গাথা, গীতিকা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, উজ্জীবিত করেছে, তাঁকে রস সিঞ্চিত করেছে, কিন্তু তিনি সে ধারা হুবহু গ্রহণ করেননি। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি নাগরিক জীবনের প্রবক্তা নন, পল্লী জীবনের প্রবক্তা। লোকপ্রেমিক হিসেবে 'বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির পরিচয়কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ব্যাপারে শিল্পী ও সামাজিক মানুষ হিসেবে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, তাই তাকে যুগ–পুরুষের মর্যাদা দিয়েছে। যুগের অপরাপর বিধা তাঁকে আকৃষ্ট করলেও, এ যুগের একটি বিশেষ প্রবৃত্তি তাঁর শিল্পকর্মে জয়যুক্ত হয়েছে। তিনি আধুনিক যুগের আধুনিক কবি। এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথ–নজরুল ইসলামের পরিমন্ডলে থেকেও রবীন্দ্র–নজরুল বলয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে একক হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। রবীন্দ্র–অনুসারী পল্লীনিষ্ঠ কবি যেমন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী–প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং নজরুলের ভাবশিষ্য কতিপয় কবি যেমন গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ শাহাদাত হোসেন, ফররুখ আহমদ প্রমুখের সগোত্র হয়েও এক অভ্রান্ত স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত ও চিহ্নিত তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র। এ ব্যাপারে তাঁর অগ্রগামী যেমন কেউ ছিলেন না, তেমনি কোন দুঃসাহসী অনুগামীও এগিয়ে এসে তাঁর পরে তাঁর একতারাটি হাতে তুলে নিতে এবং তার 'ঘুনার ঘুন' ঝংকারের সাথে প্রাণ খুলে বন্ধুরে বলে গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠতে সক্ষম হয়নি। একমাত্র মুগ্ধ অনুসারী রওশন ইয়াজদানী 'চিনুবিবি'কে নিয়ে ঘর থেকে পা বাড়িয়ে ছিলেন কিন্তু পথে এসে জসীমউদ্‌দীনের অনুসরণ করা তাঁর হয়ে ওঠেনি।

১৩৩২ বাংলা মুতাবিক ১৯২৬ ঈসায়ী সাথে কল্লোল পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় জসীমউদ্‌দীন 'কবর' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বাংলা কাব্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হলো। কবি–সভায় জসীমউদ্‌দীন স্বীকৃতি পেলেন। সেই যে শুরু, তারপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আর কলম তোলেননি।

কবি জসীমউদ্‌দীনের খন্ড কবিতার সংকলন, কাহিনী–কাব্য, নাটক, ভ্রমণ–কাহিনী, স্মৃতিচারণ মিলিয়ে প্রায় দু'ডজন বই রেখে গেছেন।

ক· খন্ড কবিতা: ১· রাখালী–১৯২৭, ২· বালুচর–১৯৩০, ৩· ধানক্ষেত–১৯৩২, ৪· রঙিলা নায়ের মাঝি–১৯৩৫, ৫· হাসু–১৯৩৮, ৬· রূপবতী–১৯৪৬, ৭· এক পয়সার বাঁশী–১৯৪৯ ৮· পদ্মাপার–১৯৫০, ৯· মাটির

কান্না–১৯৫১, ১০· গাঙের পার–১৯৫৪, ১১· হলুদ বরণী–১৯৬৬, ১২· জলের লেখন–১৯৬৯, ১৩· পদ্মা নদীর দেশ (অনুবাদ)–১৯৬৯, ১৪· ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে–১৯৭২, ১৫· মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো–১৯৭৬, ১৬· ওগো পুষ্পধনু–১৯৭৭, ১৭· মুর্শীদা গান–১৯৭৭

খ· কাহিনী কাব্য: ১· নকসী কাঁথার মাঠ–১৯২৯, ২· সোজন বাদিয়ার ঘাট–১৯৩৩, ৩· সকিনা–১৯৫৭, ৪· মা যে জননী কান্দে–১৯৬৩।

গ· অন্যান্য: ১· জীবন কথা–১৯৬৫, ২· যাঁদের দেখেছি–১৯৫২, ৩· যে দেশে মানুষ বড়, ৪· রাসুলের দেশে, ৫· বেদের মেয়ে ও অন্যান্য নাটক।

৪·

প্রথম কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে পল্লীগত–প্রাণ কবির কাব্য–ভাবনা প্রধানতঃ পল্লী–জীবনেই সঞ্চরণশীল। রাখাল ছেলের মতো মাঝে মধ্যে বাইরে গেলেও, শহরে বন্দরে এক আধবার বেড়ালেও, ঘরে ফেরার কথাই ভেবেছেন। পল্লী তাঁর ধ্যান, পল্লী তাঁর ভাবনা, পল্লী তাঁর আশ্রয়। দীর্ঘ কাব্য–যাত্রায় তাঁর শেষ গন্তব্য পল্লী, পল্লীই তার কাব্যের অধিষ্ঠান ভূমি। এ কথা আগেই বলেছি যে, ১৩৩২ সালে কল্লোল পত্রিকায় প্রথম তাঁর 'কবর' কবিতা প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় পল্লী–জীবনের এমন একটি করুণ মধুর চিত্র অংকিত হয়েছে যা বাঙালী পাঠকের মন সহজেই অধিকার করে নিয়েছিল। বহু পল্লী–গীতির সম্পাদক ও পল্লী–সংস্কৃতির গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন 'কবর' কবিতাটি পড়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি কবিকে লিখে জানান– দূরাগত রাখালের বংশী ধ্বনির মতো তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।

সত্যি 'কবর' কবিতায় বাংলার পল্লীকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায়। এ যেন চেনা মুখ, আর একবার ভাল করে দেখা। অনেক দিনের ব্যবধানে প্রবাসী পুত্র মাকে যে ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে দেখে, সেই দেখা।

> এই খানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে।
> তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।।

–এই বেদনা–বিধুর উক্তির মাধ্যমে পল্লী–জীবনের এক নিখুঁত বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে।

এই 'কবর' কবিতা প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'রাখালী' কাব্যে স্থান পেয়েছে। এ কাব্যেই জসীমউদ্‌দীনের উত্তরকালের সাহিত্যিক সার্থকতার

আভাস সূচিত হয়। 'রাখালী' কাব্যের 'রাখালী' শীর্ষক কবিতায় নকসী কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট ইত্যাদি কাহিনী-কাব্যের, প্রেম গাথার আগমনী ধ্বনি শোনা যায়। এ কাব্যেরই সিঁদুরের বেসাতি' নামক মেয়েলী সুরে রচিত সংলাপধর্মী কবিতাটিতে তাঁর লোক-নাট্য রচনার পূর্বাভাস মিলে। বস্তুতঃ 'রাখালী' জসীমউদ্‌দীনের কেবল প্রথম কাব্যগ্রন্থই নয়, প্রথম সার্থক কবি-কৃতিও। তাঁর সাহিত্যিক সার্থকতার যথার্থ পূর্ব সূচনা এ কাব্য থেকেই শুরু হয়েছে বলে জসীমউদ্‌দীনের সমগ্র সাহিত্য-কর্মের মধ্যে এ-কাব্যখানি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। এতে কবি-রচিত পাঁচটি গ্রাম্য-গানসহ মোট আঠারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে রয়েছে—'রাখালী', 'কিশোরী', 'রাখাল ছেলে', 'কবর', 'মা', 'বৈরাগী আর বোস্টমী যায়', 'জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায়', 'পল্লী জননী', 'পাহাড়িয়া', 'শাক তুলুনী', 'কৃষাণ দুলালী', 'তরুণ-কিশোর', 'মেলা শেখ', 'বোশেখ শেষের মাঠ' শীর্ষক তেরটি কবিতা আর গ্রাম্য মেয়েলী গান, বারমাসি, বন্ধের গান, ঘাটু গান, ভাটিয়ালী গানের আদলে রচিত যথাক্রমে 'সিঁদুরের বেসাতি', 'বৈদেশী বন্ধু', 'সুজন বন্ধুর মনই যদি নিবি', 'ও গহীন গাঙের নাইয়া'-শীর্ষক পাঁচটি গান।

এর সবগুলো কবিতাই কবির ছাত্রাবস্থায় লেখা। কবি বয়সে তরুণ, তাঁর চোখে স্বপ্নাবেশ, হৃদয়ে ভাবালুতা। দৃষ্টি তার আবিলতাহীন নির্মল। রাখালী কাব্যের সকল কবিতায়ই একটি অনুভূতিপ্রবণ ভাব-বিধুর কিশোর-মনের স্পর্শ পাওয়া যায়। বয়সের ধর্মে স্বপ্নাকুলতা থাকলেও অভিজ্ঞতায় তিনি বাস্তবনিষ্ঠ। তিনি গভীরভাবে বুঝেছেন, জগতে সুখের চাইতে দুঃখই বেশী সত্য, আনন্দের চাইতে দুঃখই প্রবল। প্রেম-ভালবাসায় আনন্দানুভূতি তাঁকে দুঃখের দহনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা করে দিয়েছে। তিনি দুঃখের কবি, বেদনার কবি। এই বেদনা-বোধ মহৎ শিল্পীসুলভ জীবন-বোধ সঞ্জাত বলেই জসীমউদ্‌দীনের কবিতা সামান্যকে অবলম্বন করেও অসামান্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

৫.

জসীমউদ্‌দীনের কাব্যভাবনা ও শিল্প-সুষমা এবং চিরায়ত পল্লীর রূপ-সৌন্দর্য ও কবির রূপ-কল্প বিচার করার জন্য কেবল মাত্র দুটি কবিতা পরীক্ষা করার চেষ্টা করব। রাখালী কাব্যগ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত 'কবর' ও 'পল্লীজননী' কবিতা দুটি তাঁর জীবনে প্রথম প্রশংসা ও স্বীকৃতি বয়ে নিয়ে আসে। এ দুটো

কবিতাই বাংলা ও বাংলার মানুষের চিরন্তন দুঃখের সুরে গাথা। দুটো কবিতাই কবির ছাত্রাবস্থা থেকেই স্কুল ও কলেজের পাঠ্য–বইতে স্থান পেয়ে এসেছে। এ দুটো কবিতা যত লোকে যতবার পড়েছে, তাঁর আর কোন কবিতা বা কাব্য সে সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। এ দিক থেকে এ বুহল পঠিত অতি পরিচিত কবিতা দুটোই তাঁর সারা জীবনের কাব্য–সাধনার ভূমিকা রূপে কাজ করেছে, এ কথা ভুললে চলবে না।

'কবর' কবিতায় আমরা প্রিয় পরিজন হারা এক পল্লী–বৃদ্ধের দুঃসহ শোক–বেদনার এক করুণ দৃশ্য লক্ষ্য করি। গ্রামের এ বৃদ্ধ তার আপন নাতির কাছে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্র–বধূ ও নাতনীর অকাল মৃত্যুর বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণনা করছেন। এ বেদনা করুণ শোকাবহ। বৃদ্ধের মাধ্যমে কবি চিরন্তন মানব–জীবনের শাশ্বত বাণীই তুলে ধরেছেন। বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনায় মুখর হয়ে উঠেছে তার হাহাকার, তাঁর কান্না।

এ কবিতার বর্ণিত বিষয়ে তেমন কোন চমক নেই, তেমন কোন অসামান্যতা নেই। তার কৃতিত্ব এ সাদামাটা কাহিনী, গ্রামীণ জীবনের এ ট্রাজেডি প্রাত্যহিক কথায় বলিষ্ঠ শিল্পরূপ দান করে তিনি সামান্যকে অসামান্য করে তুলেছেন। সামান্য ঘটের মধ্যে জগৎকে তুলে ধরেছেন। মৃত্যুতো অহরহ হচ্ছে, কই ব্যথায় তো তেমন কাতর হই না। আসলে মৃত্যুজনিত দুঃখ–ব্যথাকে রসাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত করে কাব্য–সুষমায় মন্ডিত করতে পেরেছেন বলেই, তা আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' কবির নিপুণ তুলিকার বলিষ্ঠ আঁচড়ে লোকজ উপাদান আধুনিক শিল্প–চেতনার সংশ্লেষে বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধের ব্যক্তি–বেদনাকে সার্বজনীন বেদনায় রূপান্তরিত করেছে। যা ছিল একার তা হয়ে উঠেছে সবাকার। যা ছিল একান্ত গৃহকোণের তা হয়ে উঠেছে সমগ্র বিশ্বের। এ বিশ্বজনীনতাই কাব্য–সাহিত্যকে চিরন্তনত্ব দান করে কালের পরীক্ষায় উত্তরণের সহায়ক হয়েছে। গভীর জীবনানুভূতি ও সামান্য হৃদয়বোধের ফলেই ব্যক্তি–জীবনের এ মর্ম–বেদনা তীক্ষ্ণ তীব্র সর্বমানবীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলার অবহেলিত পল্লী–জীবনের মুক প্রকৃতির চিরন্তন বেদনাই রূপায়িত হয়েছে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যে। আমাদের ঘরের কোণে যে এমন সোনা পড়ে আছে, একথা তিনি তুলে ধরে এনে না দেখালে আমরা জানতেও পারতাম না, বিশ্বাস করতেও পারতাম না। এদিক থেকে জনপ্রিয়তায় কবি নজরুল ইসলাম এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও বোধকরি ছাড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া এ স্বীকৃতি আর কেউ পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। এ কবিতার শিল্পরূপ নির্মাণ

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের We are Seven এবং ক্রিশ্চিয়ানা রসেটির They Grew in Beauty Side by Side-এর কথা সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁদের কবিতার নির্মাণ-কৌশলের যে Sofistication সাধারণ লোকের গ্রামীণ-মানসের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, জসীমউদ্‌দীনের পক্ষে সেই সত্যানুভূতি-সঞ্জাত মার্জিত শিল্পবোধই absolute sincerity-এর কারণে তাঁর emotion ও expression সার্থকতার সিঁড়িতে উত্তরণের সহায়ক হয়। রচনার আবহ পল্লীকেন্দ্রিক, প্রকাশ ভংগীতেও লৌকিক বাকভংগির প্রভাব লক্ষণীয়। এতে গ্রামের পারিপার্শ্বিকতা, গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ছবি পরিস্ফুট। মার্জিত হলেও ভাষা, পল্লীর পরিবেশ ও রস পরিবেশনের অনুগ। গ্রামীণ সমাজ। শিশুকালেই বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ—

এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।

তরুণ নববিবাহিত স্বামী সাত সকালে লাঙল নিয়ে ক্ষেতে যাওয়ার সময় সে সোনামুখ দেখার জন্য কী ব্যাকুলতা—

যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবিসাব মোরে তামাসা করিত শত।

দুঃখের কথা কত সুন্দর করে বলা যায়, বুনট করা যায়, কত নকসী করে আঁকা যায়,তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন কবি। বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূর কবরের ছবি কত করুণ, কত মধুর—

জোড় মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়ে
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটিয়ে পড়েছে পায়।
জোনাকি মেয়েরা সারারাতি জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।

জসীমউদ্‌দীন ঘুরে ফিরে পল্লী চিত্র এঁকেছেন পল্লীর উপাদান উপকরণে—

বনের ঘুঘু, উহু উহু করি কেঁদে মরে রাত দিন
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে যেন তারি বেদনার বীন।

সাত বছরের ছোট মেয়ে সাপের কামড়ে মারা গেছে—

আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি

দাদু, ধর ধর বুক ফেটে যায়,আর বুঝি নাহি পারি।

বৃদ্ধের বাঁচার সখ নেই—

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর
মোর জীবনের রোজ কেয়ামাত ভাবিতেছি কতদূর।
জোড় হাতে দাদু মোনাজাত করি, আয় খোদা রহমান
ভেস্ত নাজিল করিও সকল মৃত্যু ব্যথিত প্রাণ।

মুসলিম সমাজের নিঁখুত চিত্র আঁকতে কবি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ। স্নেহময়ী মায়ের একমাত্র সন্তান মৃত্যুপথ যাত্রী। তারজন্য মা—

নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে আমার ভাল করে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল করে দাও আল্লা রাসূল, ভাল করে দাও পীর,
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ননীর।

বাংলার ঘরের এ দৃশ্য। এ যে আমার নিজস্ব। একান্ত আপন পল্লী জননী। গরীব মানুষ—

ছোট কুঁড়ে ঘর,বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গনিছে ছেলের আয়ু।

মায়ের অবুঝ মন—

কতকথা আজ মনে পড়ে মার, গরীবের ঘর তার,
ছোটখাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই,
বলেছে আমরা, মুসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।

আজো রোগে তার পথ্য জোটেনি, ওষুধ হয়নি আনা,
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটি জড়ায়ে মায়ের ডানা।

Sadest thought –এর কাহিনী বলেই তা Sweetest হয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের অংকিত নারী–চরিত্র এক অতি প্রবল আবেগময়ী দুঃসাহসী

মমত্বের অধিকারী। সে দুঃখের দহনে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়। সোপেন হাওয়ার যে বলেছেন— Woman pays the debt of her life not by what she does but by what she suffers,-নারী তার কর্মে নয় তার দুঃখ-ভোগের মাধ্যমে জীবনের ঋণ পরিশোধ করে, জসীমউদ্‌দীনের নারী-চরিত্র সম্বন্ধে এ কথা সব অর্থে সত্য।

গ্রামীণ সংস্কৃতি ও পল্লী-পরিবেশ জসীমউদ্‌দীনকে কতটা আচ্ছন্ন রেখেছে, কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা তাঁর প্রতিটি কবিতায়, কাব্যে ভাস্বর হয়ে আছে। যেমন—

চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি,
দুঃছাই! কিবা শংকায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।

অথবা –

বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোর থম থম কাল রাত!

কিংবা –

জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো,
ঝিঁঝিরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।

-এ কথা, এ চিত্র কি নাগরিক শিক্ষিত পটুত্বের জীবনের অপরিহার্য অংগ?

শোন মা, আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ট্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি সিকা ভরে।
খেজুর গুড়ের নয় পাটালিতে হড়মের কোলা ভরে,
ফুলঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ পরে।

অপ্রাচুর্যের সংসারে সামান্য চাওয়া-পাওয়ার আনন্দ-বেদনা পল্লী মায়ের ঘরের নিত্যকার লীলা। একি কখনো ভোলা যায়।

ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এলো বুঝি হায়। হাঁকে মায়, দূর দূর।

-একি গ্রাম-বাংলার শাশ্বত ছবি নয়? বিশ্বাস সংস্কার মিশ্রিত এ ছবি আমার, আপনার, সবার। পল্লী-কবি পল্লীর ঘরের মানুষের ছবি আর তাদের মুখের বুলি কতভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে রূপ দিয়েছেন। এ যেন শিশুর হাতের

পুতুল। সে হাতায়ে দেখে, আবার রাখে, আবার দেখে। কিছুতেই তার সখ মেটেনা।

কিশোর বালিকার সৌন্দর্য এক কথায় এঁকে দেয়— ডানা পেলেই উড়ে যেতো হলদে পাখির ছা। তরুণের ডগমগ যৌবনের রূপ একটি মাত্র কথায় রূপায়িত হয়— জালি লাউয়ের ডগার মতো তাহার বাহু খানি। ধানের ক্ষেত যেন—ঝাঁকে আর ঝাঁকে টিয়ে পাখি গুলি শুয়েছে মাঠের পরে।

ঘরণী, ঘর আর ঘরের পরিবেশ—

> মনে পড়ে ঘর ছোনের ছাউনী, বেড়িয়া চালের লতা,
> কিষাণ বধূর বুক খানি যেন লাউয়ের লতায় পাতা।

পরিচিত পল্লীর পচা গন্ধটি—

> ভন ভন ভন জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
> এঁদো ডোবা হতে বহিছে তীব্র পচান পাতার ঘ্রাণ।

–পল্লীর কবি পল্লীর গীতি–ছন্দকে, পল্লীর প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত হয় যে, জসীমউদ্‌দীন পল্লী–জীবনকে আধুনিক রুচিসম্মত শিল্পরূপ দান করে যে কাব্যধারা গড়ে তুলেছেন, এ ধারায় তিনি একক অনন্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের, লোকগীতি ও গীতিকার আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হলেও তাঁর সৃষ্ট মানুষ সমাজ ও ছবি সহজাত শিল্পবোধের মহিমায় সমুজ্জ্বল। পল্লী–কাব্যের নবদিগন্ত উন্মোচনে তাঁর কাব্য অনন্যসাধারণ, নাগরিক নব–জিজ্ঞাসার আলোকে উদ্ভাসিত। বর্তমান যুগ–যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট মানুষ তাঁর কাব্যে অকৃত্রিম আপন চেহারার সাবেক সরলতা দেখে মুগ্ধ হবে, তার রুদ্ধ জীবনের মোক্ষণ বা Purgation–এর সুযোগ খুঁজে পাবে জসীমউদ্‌দীনের কাব্যের 'গহীনে'। দুঃসহ বেদনার উপশম হবে। হাঁফ ছেড়ে বলতে পারবে—

> পল্লীর কোণে নির্বাসিত এ ভাই–বোনগুলো হায়,
> যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়।
> তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুকে কি ব্যথা দিতেছে দোল,
> কি করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথায় সেই বোল?
> সে বন বিহগ কাঁদিতে জানেনা, বেদনার ভাষা নাই,
> ব্যাধের শায়ক বুকে বিঁধিয়াছে জানে তার বেদ নাই।

কবি জসীমউদ্‌দীনকে বুঝতে হলে বাংলার পরিচয় নিবিড়ভাবে জানতে হবে। বাংলার মুখ দেখতে হলে, তার প্রাণের পরিচয় পেতে হলে জসীমউদ্‌দীনকে পড়তে হবে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

জসীমউদ্‌দীনের বাংলা জীবনানন্দ দাশের বাংলা নয়। জীবনানন্দ দাশে কবির ব্যক্তি–কান্না শাশ্বত রূপ পেয়েছে। তিনি কাঁদেন। তাঁর অশ্রুর দর্পণে আমাদের বেদনার ছবি দেখি, মুগ্ধ হই। আর জসীমউদ্‌দীন অন্তর ফাঁটা মূক বেদনায় নিজে চীৎকার করে কাঁদেন না। তিনি কাঁদান। তিনি বলেন যত ভাবিয়ে তোলেন তার চাইতে অনেক বেশী।

হায় চিল/অথবা, আবার আসিব ফিরে/ধান সিঁড়িটির তীরে/কিংবা চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/শ্রাবস্তীর কারুকার্য/বা দারুচিনি বন– নস্‌টালজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, মুগ্ধ করে; অতীতের প্রতি মোহময়তা আমাদের আচ্ছন্ন করে। না পাওয়ার বেদনা মধুর, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যে আচ্ছন করে মায়াজাল বিস্তার করে। সে–সুদূরের শান্তি–সুখের অতীতকে আপন করে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

কিন্তু জসীমউদ্‌দীনের দূরাগত বাঁশীর বেদনার্ত মূর্ছনা আমাদের বর্তমানকে অন্তরে ধারণ করার স্থৈর্যে অভিষিক্ত করে। ছবিতে নয়, কল্পনায় নয়, রূঢ় বাস্তবে, সশরীরে আমাদের আটপৌরে রক্ত–মাংসের মাকে, মাটিকে আপন করে পাই। তাঁকে দেখি, স্পর্শ করি। তিনি আমাদের বুকে তুলে নেন। আদর করেন। চুমো দেন। তাঁর উষ্ণ পরশ আমাদের ক্লান্তি দূর করে, গ্লানি মুছে দেয়, আমাদের শান্ত করে, আমাদের সান্ত্বনা দেয়। আমাদের কান্নার সুযোগ করে দেয়। আমাদের মূক বেদনা কান্নার ভাষা খুঁজে পায়। আমাদের বোবা কান্না অঝোর ধারায় অশ্রু বিগলিত হয়ে, আমাদের বুকের ভার হালকা করে দেয়। আমাদের দুঃখের উপশম হয়, purgation হয়। শান্ত স্নিগ্ধ তৃপ্ত আত্মা ঝড়ে বিধ্বস্ত হাল–ভাংগা নাবিক যেন স্বস্তির আশ্রয় খুঁজে পায়, শ্রান্ত ক্লান্ত ডানা–ভাংগা পাখি ফিরে আসে সান্ধ্য কুলায়–পরম নির্ভরে শান্তির পরম আশ্রয়ে। আশ্বস্থ হয়। প্রাণে ধ্বনিত হয় পরম স্রষ্টা পালনকর্তার সে শাশ্বত সান্ত্বনার বাণী— ইয়া আইয়াতুহান্ নাফসুল মুতমাইন্নাতুর জিয়ি ইলা রাব্বিকে রাদিয়াতাম মারদিয়া–হে পরিতৃপ্ত আত্মা ফিরে এসো তোমার রবের কাছে– প্রতিপালক প্রভুর আশ্রয়ে পরম সন্তোষ ও শান্তির ধামে, শান্ত সমাহিত চিত্তে।

নির্দেশিকা

১· জসীমউদ্‌দীন ঃ কাব্য সমগ্র।

	ঃ	জীবন কথা।
	ঃ	মুর্শীদা গান।
	ঃ	যাঁদের দেখেছি।
	ঃ	ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়।
২· দীনেশচন্দ্র সেন	ঃ	পূর্ব বংগ গীতিকা।
	ঃ	প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান।
৩· আশুতোষ ভট্টাচার্য	ঃ	বাংলার লোকসাহিত্য ও লোক-গীতিকা।
৪· মোহিতলাল মজুমদার	ঃ	আধুনিক বাংলা সাহিত্য।
৫· এ. কে.এম. আমিনুল ইসলাম	ঃ	জসীমউদ্‌দীন: কবি ও কাব্য
৬· সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়	ঃ	জসীমউদ্‌দীন: কবি-মানস ও কাব্য-সাধনা।
৭· অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	ঃ	কল্লোল যুগ।
৮· মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।
৯· কাজী দীন মুহম্মদ	ঃ	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)